নিরাপত্তায় প্রযুক্তি

ইমদাদুল হক

প্রযুক্তির কল্যাণে ইতোমধ্যেই হোঁচট খেয়েছে টেন্ডার ত্রাস। চুরি করে পগার পার হলেও ছাপ রেখে দিচ্ছে সিসি/আইপি ক্যাম। ফোনে হুমকি দিলেও কল রেকর্ড বিশ্লেষণ করে পাকড়াও করা সম্ভব হচ্ছে অপরাধীকে। লুকিয়ে অস্ত্র বহন করে সহজেই পৌঁছানো যাচ্ছে না ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি। লুকিং গ্লাসে চোখ না লাগিয়েও দেখা যাচ্ছে ঘরে প্রবেশের অপেক্ষমাণ ব্যক্তির ছবি। লাইভ স্ট্রিমিং ও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সময় ও অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। ঘরে বসেই মিলছে নিত্য সদাই। ডাক্তারের কাছে না গিয়েও চিকিৎসা সেবা মিলছে। কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই চলছে অস্ত্রোপচার। জরিপ-পর্চা তুলতে দিনের পর দিন ধর্না দিতে হচ্ছে না। দিনের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে নিভে যাচ্ছে বাতি। আলোর সাথে মিতালি করছে স্মার্টপর্দা। ব্ল্যাক বোর্ডের জায়গায় হোয়াইট বোর্ডগুলোতে থাকছে রাজ্যের পাঠ। হিসাব করতে ক্যালকুলেটর বা হাতের কর গোনার সময় কোথায় আজ।

এভাবেই নানা কাজে প্রযুক্তির সংশ্লেষে জীবনশৈলীতে ঢের গতি বেড়েছে। প্রযুক্তির স্বয়ংক্রিয় অনেক সুবিধাই আজ জীবনকে পল্লবিত করছে। নিকট হয়েছে দূর। কায়িক শ্রমের কষ্ট ঘুচছে দিন দিন। তবে বৈশ্বিক পরিবর্তনের হাওয়ায় এর সাথে পাল্লা দিয়ে যেন দুর্গতিও পিছু ধাওয়া করছে। গোপন ক্যামেরায় আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে ভার্চুয়াল আকাশে। প্রপাগাণ্ডাও চলছে। আলোর গতিতে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। পরিচয় লুকিয়ে নানা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সাধারণের অগোচরে সংঘবদ্ধ হচ্ছে অপরাধী চক্র। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অর্থ আত্মসাৎ হচ্ছে। প্রলোভনের ফাঁদ পেতে সর্বস্বান্ত করা হচ্ছে অনেককেই। ভাইরাস-অ্যান্টিভাইরাসের লড়াই এখন আর পিসির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। প্রাত্যহিক জীবনেও হানা দিয়েছে।

সঙ্গত কারণেই প্রযুক্তির নানা আয়োজন জীবনের পরতে পরতে স্বস্তি দিলেও এর বৈরী ব্যবহার আর অসচেতনতায় প্রযুক্তির বাঁকেও ভর করেছে অনিশ্চয়তা আর ঝুঁকি। ভীতসন্ত্রস্ত থাকতে হচ্ছে প্রযুক্তি ব্যবহারে বরাবরই এগিয়ে থাকা বাংলাদেশীদের। তাদের কাছে এ মুহূর্তে নিরাপত্তায় প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রযুক্তির নিরাপত্তাকে করায়ত্ত করাটাই খাদ্য, বস্ত্র আর বাসস্থানের মতোই মৌলিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভার্চুয়াল আকাশের প্রপাগাণ্ডা থেকে শুরু করে সিম ক্লোনিং, বিকাশ জালিয়াতি, রাষ্ট্রীয় কোষাগার হ্যাকড কিংবা গুলশান, শোলাকিয়া, কল্যাণপুর, নারায়ণগঞ্জ ইস্যু যেন এই নিরাপত্তার তাগাদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি হুমকি মোকাবেলায় দিন দিন বাড়ছে প্রযুক্তির ব্যবহার। এই হুমকি মোকাবেলায় রাজধানীসহ দেশজুড়ে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, আইপি ক্যামেরাসহ অন্যান্য নিরাপত্তাসামগ্রী কেনা ও স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। সব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীর আবাসস্থল, বিভিন্ন আশ্রম-মন্দির-গির্জা-ঈদগাহ প্রাঙ্গণ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হচ্ছে। সংসদ ভবনের আশপাশ সিসি ক্যামেরার আওতায় আনার সুপারিশ করেছে এ-সংক্রান্ত কমিটি। বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিভাগীয় সব শহর এমনকি নিভৃত পৌর এলাকাটিরও নিরাপত্তার ভরসা হয়ে উঠছে এই যান্ত্রিক চোখ। নিরাপত্তার ঝুঁকি যেসব এলাকায় বেশি, সেসব এলাকায় সিসি ক্যামেরার পাশাপাশি পাহারাও বাড়ানো হয়েছে। বিশেষ করে ঢাকার বাসাবাড়ি, অফিস, শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, শিক্ষা-শিল্পপ্রতিষ্ঠান, পার্কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ইতোমধ্যেই নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনা হয়েছে। শুধু বাসাবাড়ি, অফিস আর শপিং মলই নয়, মহাসড়কগুলোতে যানবাহন আটকে চাঁদাবাজি ও যানজট ঠেকাতে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, ওয়াচ টাওয়ার ও কন্ট্রোল রুম চালু করা হচ্ছে। হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট স্থাপন করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-গাজীপুর ও ঢাকা-আরিচাসহ বিভিন্ন মহাসড়কে এই ব্যবস্থা থাকবে। এই লক্ষ্যে জেলা ও হাইওয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে আগাম প্রস্তুতি নেয়া শুরু হয়েছে। সিসি ক্যামেরায় গাড়ির নম্বর দেখে করা হবে ডিজিটাল জরিমানা। ওয়াচ টাওয়ার থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপরাধী বা যানজট সৃষ্টিকারী গাড়ি শনাক্ত করা হবে। এ নিয়ে ইতোমধ্যেই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অবস্থান নেয়ার ছক তৈরি করা হচ্ছে। গত কয়েক মাস ধরেই এর প্রভাব পড়তে শুরু করেছে প্রযুক্তি বাজারে। মাস ব্যবধানে প্রযুক্তি নিরাপত্তার বিক্রি বেড়েছে প্রায় ৩২ শতাংশ।

নিরাপত্তায় যত প্রযুক্তিপণ্য

অনলাইন ও অফলাইনের নিরাপত্তায় প্রযুক্তিপণ্য ও সেবার ব্যবহার দিন দিনই বাড়ছে। এর মধ্যে অ্যান্টিভাইরাস ও সিসি ক্যামেরার প্রাধান্য থাকলেও রয়েছে মেটাল ডিটেক্টর, ডিভিআর, আর্চওয়ে, অটোগেট, পার্কিং ব্যারিয়ার, সিসি ক্যামেরা, বারকোড, অ্যাক্সেস কন্ট্রোলার, ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম, ইলেকট্রনিক্স সার্ভিস সিস্টেম সলিউশন, গাড়ির জন্য ভেহিকল ট্র্যাকিং সিস্টেম ইত্যাদি নানা পণ্য। তবে এসব ছাপিয়ে সিসি ক্যামেরার কদর হালে বেড়েছে। সিসি ক্যামেরা স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান জিরো সার্কেল লিমিটেডের কর্ণধার বিপ্লব হাসান বলেন, বর্তমানে নিরাপত্তাবিষয়ক প্রযুক্তির চাহিদা বেড়েছে। সেই সাথে কাজের চাপও অনেক বেশি। আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজের অর্ডার পাচ্ছি।

নিরাপত্তায় যুক্ত হচ্ছে দেশী প্রযুক্তি

বৈশ্বিক জেব্রা, হানিওয়েল, মটোরোলা ব্র্যান্ডের নিরাপত্তা পণ্যের পাশাপাশি দেশেই এখন তৈরি হচ্ছে নিরাপত্তা প্রযুক্তির স্মার্ট ক্যামেরা। এই ক্যামেরা তৈরি করছে অ্যাপলটেক বিডি। সলিনয়েড লেন্সের এই ক্যামেরা শুধু আলো-আঁধারির সচিত্র ছবি ধারণ ও সংরক্ষণ নয়, চেহারা শনাক্ত করে মুঠোফোনে কর্তাকে সচকিত করতে অ্যালার্মও বাজায়। চলতি মাসেই এর বিপণন শুরু হতে যাচ্ছে বলে জানালেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী মো: সাইফুল্লাহ। বললেন, বাসাবাড়ি-অফিস-আদালতের নিরাপত্তায় আমরা সাধারণত যে সিসি বা আইপি ক্যামেরা ব্যবহার করি, তা কিন্তু যথেষ্ট নয়। এই ধরুন, এগুলোর ব্যবহার দেয়ালের বাইরে কিংবা সিঁড়ির গোড়ায় হয়ে থাকে। কিন্তু যদি শোবার ঘরে হয়, তখন কি আপনি সিসি ক্যামেরা লাগাবেন? নিশ্চয় নয়। বিষয়টি আমলে নিয়েই আমরা আমাদের গবেষণাগারে আরও উন্নত প্রযুক্তির সিকিউরিটি ক্যামেরা আনার চেষ্টা করছি। এটি আপনার চলাফেরা কিংবা শরীরের ভাষা পড়তে পারবে।

সিসি ক্যামেরা

চুরি-ডাকাতি বা অন্য যেকোনো ঘটনার পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে এখন সিসি ক্যামেরা জরুরি হয়ে পড়ছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে থাকা অনেকে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা বা সিসি ক্যামেরা স্থাপন করার দিকে জোর দিচ্ছেন। বর্তমানে বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সিসি ক্যামেরা বিক্রি হচ্ছে। এর মধ্যে এভিটেক, ডাইয়ো, ক্যাম্পো, হিকভিশন, জিন ও ইয়োমাট ব্র্যান্ডের সিসি ক্যামেরা বিক্রি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। এগুলো চীন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও আমেরিকা থেকে আমদানি করা হচ্ছে। মান ও প্রকারভেদে প্রতিটি সিসি ক্যামেরা ১ হাজার ১৫ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে আউটডোর বুলেট ক্যামেরার (স্পিড ডোম) একেকটির দাম ৪৮ হাজার থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত। চারটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন ও সংযোগের জন্য বক্সের দাম পড়ছে সর্বনিম্ন ৪ ▸

হাজার থেকে ৭ হাজার টাকা। ৮টি ক্যামেরা সংযোগের জন্য খরচ হবে ৫ হাজার থেকে ৯ হাজার টাকা। ১৬টি ক্যামেরা সংযোগের জন্য সর্বনিম্ন খরচ হবে সাড়ে ৮ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা। আর ৩২টি ক্যামেরা সংযোগের জন্য বক্সের দাম পড়বে ৮ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

ডোর মেটাল ডিটেক্টর

সাধারণত বড় শপিং মল বা জনগুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোতে প্রবেশের আগে যে যন্ত্রটির মাধ্যমে প্রত্যেককে পরীক্ষা করা হয় সেটিই মেটাল ডিটেক্টর। তবে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের মেটাল ডিটেক্টরই সাধারণ মানের হলেও এটির নিচ দিয়ে হেঁটে গেলে পয়সা, চাবির রিং বা মোবাইল ফোন থাকলেও বেজে ওঠে না। তবে কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র, যেমন– পিস্তল, রিভলবার, গ্রেনেড ও বড় ছুরি সহজেই শনাক্ত করতে পারবে। একটি মেটাল ডিটেক্টর সর্বনিম্ন ২ হাজার থেকে সাড়ে ৩ হাজার টাকায় পাওয়া যায়। এই প্রযুক্তির আরেকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হলো– অস্ত্র বহনকারীর দুটি ছবিও তুলে রাখে। এ ধরনের একটি পরিপূর্ণ ভালো মানের মেটাল ডিটেক্টর কিনতে খরচ হবে ১ লাখ ১৫ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ টাকা পর্যন্ত।

সিসিটিভি সিস্টেম

ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন ক্যামেরার সংক্ষিপ্ত রূপ হলো সিসিটিভি ক্যামেরা। এটি এমন এক ধরনের নিরাপত্তা ক্যামেরা, যেটি বাসা বা অফিসের নির্দিষ্ট লোকেশনে সেট করা থাকে এবং এ থেকে ধারণ করা ভিডিও একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে এক বা একাধিক টেলিভিশন মনিটরে প্রদর্শিত হয়। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা আছে এমন সব স্থানে যেমন– ব্যাংক ও শপিং মলে এ ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। যেখানে এ ধরনের

ক্যামেরা লাগানো হবে, সেই এলাকাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে সাধারণত ৪টি, ৮টি অথবা ১৬টি ক্যামেরা লাগানো হয়। এরপর 'সেফ জোনে' একটি কেন্দ্রীয় মনিটরিং ব্যবস্থা থাকে, যেখানে টেলিভিশন মনিটরের মাধ্যমে একজন মানুষ পুরো এলাকার ওপর নজর রাখতে পারে। ব্যবহারের ভিন্নতার কারণে সিসিটিভি ক্যামেরা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– সাধারণ ক্যামেরা, ডোম ক্যামেরা, হিডেন ক্যামেরা, স্পাই ক্যামেরা, স্পিড ডোম পিটিজেড ক্যামেরা, ডে-নাইট ক্যামেরা, জুম ক্যামেরা, ভেন্ডাল প্রুফ ক্যামেরা ও আইপি ক্যামেরা। ইনডোর সিসিটিভিগুলোর জন্য খরচ পড়ে ৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা। আউটডোর সিসিটিভি লাগাতে খরচ হবে ৪৫ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা।

ডিভিআর

কোনো বড় অফিস বা মিল-কারখানার নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার হয় ৮ বা ১৬ চ্যানেলের স্ট্যান্ড অ্যালোন অ্যামবেডেড ডিভিআর (ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার) এবং বিল্টইন ডিভিডি রাইটার। ক্যামেরার ছবি একই পর্দায় একসাথে দেখা যায় এবং আলাদাভাবে হার্ডডিস্কে রেকর্ড হয়। এ ছাড়া হাই স্পিড ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো জায়গা থেকে লগইন করে লাইভ সিসিটিভি মনিটরিং বা রেকর্ডিং করা যায়। ডিভিআর লাগাতে চাইলে খরচ হবে ৩৫ হাজার থেকে ৯৫ হাজার টাকা।

কিপ্যাড ডোর লক

বাড়ি, অফিস বা অ্যাপার্টমেন্টের নিরাপত্তার জন্য স্বয়ংক্রিয় কিপ্যাড ডোর লক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। দরজার মধ্যে এই যন্ত্রটি লাগাতে হয়। পাসওয়ার্ড বা কোড নম্বর দিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দরজার লক খুলে যায়। ইন্টারকম সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে অ্যাপার্টমেন্টের যেকোনো ফ্ল্যাট থেকে ইন্টারকমের একটি বাটন চেপে দরজার লক খুলে দেয়া যায়। স্বয়ংক্রিয় কিপ্যাড ডোর লক সিস্টেমের জন্য খরচ হবে ৫ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত।

স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম সিস্টেম

এই যন্ত্রটির ৮ থেকে ১০ মিটারের মধ্যে কেউ এলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কেত দেবে। একটি সঙ্কেত বা অ্যালার্মের সাথে অনেকগুলো ফটোসেল ব্যবহার করা যায়। অ্যালার্মের সময় নিজেদের পছন্দমতো সেট করা যায়। একবার অ্যালার্ম বাজার পর ওই এলাকায় কোনো লোক থাকলে আবারও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঙ্কেত দেবে। প্রয়োজনে রিমোট কন্ট্রোল সুইচ ব্যবহার করা যায়। রিমোট কন্ট্রোল সুইচের মাধ্যমে এই সিস্টেমকে চালু বা বন্ধ করা যায়। স্বয়ংক্রিয় অ্যালার্ম সিস্টেম স্থাপন করতে চাইল গুনতে হবে ৭ হাজার থেকে ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত।

অ্যাক্সেস কন্ট্রোল

সাধারণত বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের নিরাপত্তা প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা কখন অফিসে যাচ্ছে বা কখন বের হচ্ছে সেটি জানার জন্যই মূলত অ্যাক্সেস কন্ট্রোল এবং টাইম অ্যাটেনডেন্স সিস্টেম ব্যবহার হয়। ডিজিটাল কার্ড, পাসওয়ার্ড অথবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে 'আন-অথরাইজড' প্রবেশও বন্ধ করা যায়। একেকটি কার্ডে একেক কোড থাকে। কর্মীরা যখন এ কার্ড 'পাঞ্চ' করে তখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে এ প্রযুক্তি কর্মীর প্রবেশ সময় রেকর্ড করে রাখে। ওই কর্মী যখন আবার অফিস থেকে বের হবেন তখনও তাকে দরজায় কার্ড স্পর্শ করেই দরজা খুলতে হয়। তখন কর্মীর অফিস ত্যাগের সময়ও প্রযুক্তিটি নিজ থেকে রেকর্ড করে রাখে। অফিসের কর্মচারীদের আসা-যাওয়া মনিটর করার প্রযুক্তি অফিস অ্যাটেনডেন্স ব্যবহারের জন্য খরচ পড়ে ৯০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত।

ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম

এ প্রযুক্তিটি আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকলে সতর্কসঙ্কেত দিয়ে থাকে। অপটিক্যাল স্মোক ডিটেক্টর বা হিট ডিটেক্টর ডিভাইসটি আগুন লাগার আশঙ্কা আছে এমন এলাকায় রাখতে হয়। সেটা দেয়াল অথবা সিলিং হতে পারে। ডিভাইসটি ধোঁয়ার উপস্থিতি বুঝতে পারে এবং এর পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সতর্কসঙ্কেত বাজিয়ে দেয়। বাজারে রয়েছে ইলেকট্রিক সাউন্ডার ডিভাইসও। আগুনের সঙ্কেত ডিটেক্টর থেকে পাওয়া গেলে এই অ্যালার্ম সিস্টেমটি নির্দিষ্ট এলাকায় সাইরেন অথবা প্রচণ্ড শব্দ করে জানিয়ে দেয় যে আগুন ধরেছে। এ ধরনের প্রযুক্তি স্থাপন করতে চাইলে খরচ হবে ১০ হাজার থেকে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত।

সাইবার অপরাধের রকমফের

ই-মেইলভিত্তিক প্রতারণা স্প্যামিং, ফিশিং, ম্যালওয়্যার জাঙ্ক মেইল, ফ্রি সাবস্ক্রাইব ফাঁদ চিনতে না পেরে মাঝেমধ্যেই সাইবার হামলার শিকার হচ্ছেন অনেকেই। বখাটেদের সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন কেউ কেউ। ফোন ফ্রডের কবলে পড়ে সর্বনাশ ঘটছে। অনলাইনে কোনো বিজ্ঞাপন দেখে ক্লিক করে ম্যালভার্টাইজিংয়ের খপ্পড়ে পড়ছেন। ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড স্কিমিং হওয়ার পরও ঠাওর করতে পারছেন না। আবার আক্রান্ত হলে কীভাবে বা কোথায় গিয়ে পরিত্রাণ মিলবে, তাই নিয়েও ধুমায়িত পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে দেশের সাধারণ মানুষ। সাইবার অপরাধ নিয়ে পুলিশের বিশেষ বাহিনী র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদ জানান, দেশে সাইবার হামলার ঘটনা ঘটলে কোন কোন জায়গাগুলো আক্রমণের শিকার হতে পারে এবং এর ফলে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে, এসব নিয়ে সরকার গত দুই বছর ধরে কাজ করছে। গত ১৩ আগস্ট রাজধানীতে সাইবার অপরাধবিষয়ক এক সেমিনারে তিনি এ তথ্য জানান। র‍্যাব মহাপরিচালক বলেন, একজন নারী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হয়রানি হলে সেটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া ওই নারীর কাছে খুবই গুরুত্বের বিষয়। কিন্তু তুলনামূলক তারচেয়েও বহু গুরুত্বপূর্ণ মামলার তদন্তকাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয় পুলিশ কর্মকর্তাদের। এ জন্য সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। এদিকে অপরাধীদের শাস্তি দিতে ▸

ক্রমাগত সাইবার সংক্রান্ত অপরাধ বাড়ার কারণে 'তথ্য ও প্রযুক্তি আইন ২০০৬' নামে আমাদের দেশে আইন পাস হয়। এটি ২০১৩ সালে সংশোধিত হয়। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৬ ধারায় বলা হয়েছে– ০১. যদি কোনো ব্যক্তি জনসাধারণের বা কোনো ব্যক্তির ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে বা ক্ষতি হবে মর্মে জানা সত্ত্বেও এমন কোনো কাজ করেন, যার ফলে কোনো কমপিউটার রিসোর্সের কোনো তথ্য বিনাশ, বাতিল বা পরিবর্তিত হয় বা তার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস পায় বা অন্য কোনোভাবে একে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ০২. এমন কোনো কমপিউটার সার্ভার, কমপিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে এর ক্ষতিসাধন করেন, যাতে তিনি মালিক বা দখলদার নন, তাহলে তার এই কাজ হবে একটি হ্যাকিং অপরাধ। কোনো ব্যক্তি হ্যাকিং অপরাধ করলে তিনি অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন, ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হতে পারেন বা উভয় দণ্ড দেয়া যেতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৭ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র বা ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানি প্রদান করা হয়,

বিচারকাজে ভিডিও কনফারেন্স

নিরাপত্তার স্বার্থে শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসীদের বিচারে ভিডিও কনফারেন্সের (ক্যামেরা ট্রায়াল) উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ জন্য গত ২৮ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের সাথে সুপ্রিমকোর্টের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। সুপ্রিমকোর্টের পক্ষে রেজিস্ট্রার জেনারেল সৈয়দ আমিনুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রকল্পের পরিচালক কবির বিন আনোয়ার সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা গণমাধ্যমকে বলেন, অনেক সময় টেররিস্টকে জেল থেকে আদালতে নেয়ার সময় মাঝপথে সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এই ধরনের সমস্যা এড়ানোর জন্য আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে কনফারেন্সের মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করব। একই সাথে বিচারিক কাজে গতি আনতে এবং যেসব আসামির আদালতে হাজির করায় ঝুঁকি রয়েছে, তা এড়াতে 'ভিডিও কনফারেন্স' চালু করা হচ্ছে। প্রধান বিচারপতি বলেন, পুলিশ অভিযোগ করেছে কারাগারে থাকা সন্ত্রাসীদের বিভিন্ন মামলায় এক জেলা থেকে আরেক জেলায় নিতে তাদের খুবই অসুবিধা হয়। মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত একজন শীর্ষস্থানীয় সন্ত্রাসীকে জেল থেকে আদালতে নেয়ার সময় মাঝপথে সন্ত্রাসীরা ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এগুলো অতিক্রম করতে আমরা ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করতে চাচ্ছি। তিনি বলেন, এই রকম যারা আছে, তাদের সরাসরি কোর্টে হাজির না করে আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে তাদের বিচারকাজ চালাব। এতে বিচার খুব ত্বরান্বিত হবে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাও অটুট থাকবে বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রসঙ্গত, ইতোমধ্যেই সুপ্রিমকোর্ট এবং পরীক্ষামূলকভাবে তিন জেলায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু, কল লিস্ট ও মামলার তথ্য অনলাইন ও এসএমএসের মাধ্যমে সরবরাহ, সুপ্রিমকোর্ট ও এর অধীনস্থ আদালতের মামলার তথ্য খোঁজার জন্য মোবাইল অ্যাপস তৈরি এবং আদালত প্রশাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য ওয়েবভিত্তিক জুডিশিয়াল অফিসার্স ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা হয়েছে।

বিক্রি বেড়েছে সরকারি পর্যায়ে

সাম্প্রতিক সময়ে টার্গেট কিলিং ও জঙ্গি হামলার ঘটনার পর দেশজুড়ে নিরাপত্তা জোরদারে বিভিন্ন এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসানোর হিড়িক পড়েছে। নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় রাজধানীর শুধু গুলশান এলাকার সড়কেই স্থাপন করা হয়েছে ৬ শতাধিক সিসি ক্যামেরা। আর গত ২৫ মে উত্তর সিটি করপোরেশনের আওতায় ৩ হাজার সিসি ক্যামেরা স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। সিসি ক্যামেরায় ধারণ করা চিত্র নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছে পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ। অসঙ্গতিপূর্ণ কোনো দৃশ্য চোখে পড়লেই সংশ্লিষ্ট থানাকে জরুরি বার্তা পাঠিয়ে করণীয় জানিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে বাসাবাড়ি বা অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভিডিওচিত্র পুলিশের নিবিড় তদারকির বাইরে রয়েছে। ঘটনা ঘটলে, হইচই পড়লে, চাপে পড়ে পুলিশ ওইসব ভিডিওচিত্র সংগ্রহ করে থাকে। পুলিশ কন্ট্রোল রুমের এক কর্মকর্তা বলেন, কোনো এলাকায় যদি সন্দেহজনক কিছু মনিটরিংয়ে ধরা পড়ে, ওয়্যারলেস বা মোবাইল ফোনে সাথে সাথে তা জানিয়ে দেয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্টদের। থানা পুলিশ বা টহল পুলিশ তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে ছুটে যাচ্ছে। গুলশান জোনের পুলিশের উপকমিশনার মোস্তাক আহমেদ গণমাধ্যমকে জানান, সিসি ফুটেজের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি মনিটর করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, স্পর্শকাতর ও সন্ত্রাসপ্রবণ এলাকার সিসি ক্যামেরায় পুলিশসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বিভিন্ন বাহিনীর গতিবিধিও পর্যবেক্ষণে রাখা যাচ্ছে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, স্বল্প সময়ের মধ্যে সব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের বাসায় সিসিটিভি লাগাতে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে এরই মধ্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এ জন্য দায়িত্ব দিয়েছে গণপূর্ত অধিদফতরকে। যেসব মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী নিজেদের বাসায় থাকেন, তাদের বাসায় সিসি ক্যামেরা লাগানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে পরিকল্পনা কমিশন প্রাঙ্গণে স্থাপন করা

আছে আর্চওয়ে, স্ক্যানার, সিসি ক্যামেরা। নতুন করে বসানো হচ্ছে রোড স্ক্যানার। পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) সম্মেলন কক্ষে প্রায় প্রতি সপ্তাহে একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। একই চত্বরে আছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। এখন কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র ও বহিরাগতদের পাস না থাকলে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না। পরিকল্পনা কমিশন সূত্র জানায়, রোড স্ক্যানার বসানো হলে প্রবেশপথে সবকিছুই স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্ক্যানিং হবে। সরকারি-বেসরকারি গণপরিবহনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেগুলোতে সিসিটিভির মাধ্যমে চিত্র ধারণ করে চলাফেরার ওপর জোর দেয়া হচ্ছে। রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, রাজধানীর কমলাপুর রেলস্টেশনে সিসিটিভি ক্যামেরায় নিয়মিত চিত্র ধারণ করা হচ্ছে। গত ২১ জুলাই যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি লঞ্চে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন ও মেটাল ডিটেক্টর রাখতে লঞ্চের মালিকদের আহ্বান জানিয়েছেন নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান।

বুয়েটেও আছে সিকিউরিটি সেল

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের প্রধান ড. মোহাম্মদ সোহেল রহমান বলেন, সচেতনতার অভাবেই মূলত আমরা ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উভয় পর্যায়েই সাইবার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি। এ ছাড়া নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গিয়ে স্পর্শকাতর জায়গাগুলোতে স্বদেশী বিশেষজ্ঞদের বাইরে অন্য কারও প্রবেশ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা দরকার। আর যদি নিজেদের বিশেষজ্ঞদের ওপর আস্থা রাখতে সমস্যা হয়, তবে তাদেরকে বিদেশী এক্সপার্ট দিয়ে প্রশিক্ষণ করানো যেতে পারে। একই সাথে ব্যাংকের ভোল্টকে সুরক্ষিত রাখতে যেভাবে বিশেষ নজরদারিতে রাখা হয়, ভোল্ট কেনার আগে এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা খতিয়ে দেখা হয়, নিরাপত্তা ডিভাইস বা অ্যাপ্লিকেশন কেনা ও ব্যবহারের আগেই এর সক্ষমতা যাচাই করে দেখা উচিত। পাশাপাশি সিকিউরিটি লুপহোলগুলো নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

ড. মোহাম্মদ সোহেল রহমান
বিভাগীয় প্রধান
কমপিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তি দুনিয়ায় পাসওয়ার্ড হচ্ছে সিন্দুকের মতো। তাই এই পাসওয়ার্ড দেয়ার বিষয়ে যেমনটা কৌশল অবলম্বন করা উচিত, একইভাবে এটি যেনো অন্য কেউ না জানে সে বিষয়টিও নিশ্চিত করা দরকার। গবেষণায় দেখেছি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রাখতে সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে দুইজনের সম্মতি নেয়ার ব্যবস্থা চালু থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই ভেরিফাইড প্রটোকল দেখভাল করার কাজে নিয়োজিত উভয় ব্যক্তিই একে অপরের পাসওয়ার্ড জানেন। কিংবা তারা কমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করেন। কিংবা অফিসার ছুটিতে যাওয়ার সময় তার পাসওয়ার্ড বলে দিয়ে যান। সে সময় একজনই দুইজনের রোল প্লে করেন। ফলে একাধিক ভেরিফিকেশন সিস্টেম কার্যত অকেজো হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ফিজিক্যালি সেপারেটেড পলিসি গ্রহণ করা দরকার। এ ক্ষেত্রে ভেরিফিকেশনে আলাদা দুটি কমপিউটার ব্যবহারে জোর দিতে হবে। সর্বোপরি চলমান সাইবার ঝুঁকি মোকাবেলায় আমাদের নেচারকে পরিবর্তন করতে হবে সবার আগে। আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে, এখানে কিছু কিছু জিনিস আছে প্রায়োগিক। যেমন– ওয়েব সাইটগুলোর ভালনারেবিলিটি। হ্যাকারেরা যে জাতীয় সংসদের সাইট দখল করে নিল। আমাদের বুয়েটের সাইটও হ্যাক করেছিল। আমরা সাথে সাথে পুনরুদ্ধার যদিও করতে পেরেছি, কিন্তু হ্যাক তো হয়েছে। আমাদের এখানে সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে কাজ আগে বেশি হয়নি। তাই পিছিয়ে যে আছি তা স্বীকার করে নিতে হবে। আত্মসমালোচনা অনেক ক্ষেত্রেই জরুরি। বাইরের ওরা অনেক দিন ধরেই সাইট জোরদারে কাজ করছে। কিছু সফটওয়্যার আছে, যেগুলো দিয়ে সাইটের দুর্বল জায়গাগুলো চিহ্নিত করা যায়। এমন সফটওয়্যার হয়তো আমাদের কিনতে হবে। আমরাও কেনার চেষ্টা করছি। তা করছি দায়বদ্ধতা থেকে। আমাদের তো এত ফান্ড নেই। সাইট নিরাপদ করতে চাইলে সবাইকে এরকম সফটওয়্যার কিনতে হবে। আমাদের ছেলেরাও হয়তো তৈরি করতে পারবে। কিন্তু তার জন্য দরকার আর্থিক প্রণোদনা। এটা সংস্থান করা হলে বিদেশী নির্ভরতা কমিয়ে নিয়মিত অর্থ গচ্ছা দেয়ার চেয়ে নিজেদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করতে পারব।

তিনি আরও বলেন, আমাদের অত্যাধুনিক অনেক সফটওয়্যার আছে। এ নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে। আমাদের শিল্প খাত ও শিক্ষা গবেষণায় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। সরকারি-বেসরকারি দুই খাতের লোকজনই আমাদের কাছে আসতে পারেন। রিয়েল টাইম ইমেজ প্রসেস করে সম্ভাব্য ঝুঁকির বিষয়ে আমরাও সহায়তা করতে পারব সফটওয়্যার সুবিধা নিয়ে। এটা খুব দরকার। এ নিয়ে আমাদের লংটার্ম ভিশন থাকতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি একটা নীতিমালা থাকলে বিল্টইন সিকিউরিটিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আর নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটা বড় অংশ হচ্ছে হিউম্যান অ্যাটিচিউড। ব্যবস্থাটি কার্যকর থাকলে সাধারণ মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, অপরাধীরাও সাবধান হয়ে যায়। আমরা যে কত অপ্রস্তুত, হলি আর্টিজানের ঘটনায় তা প্রমাণিত হলো। শুরুতে যে দুজন পুলিশ কর্মকর্তা মারা গেলেন, এটা প্রতিরোধ করা যেত যদি সিসিটিভি বা অন্য কোনোভাবে তাৎক্ষণিক পুলিশ রিয়েল চিত্রটা দেখার সুযোগ পেত। অনেক সময় হ্যাকারেরা সিসিটিভির ফুটেজও বদল করে দিতে পারে। তা ঠেকানোর সামর্থ্যও আমাদের অর্জন করতে হবে। আমাদের ধাপে ধাপে এগোতে হবে। প্রথমে মনে হবে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো অনেক টাকা অনেক জায়গায় খরচ করছি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিরাপত্তার মূল জায়গাটাতেই নজর দেয়া হচ্ছে না। এই যেমন অনেকেই সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করছেন। কিন্তু সেগুলো দেখার ব্যবস্থা পুলিশের কাছে নেই। তাই বড় কোনো প্রতিষ্ঠান চালু করার আগেই সিসিটিভি স্থাপন বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি সিসিটিভির ফুটেজ যেন পুলিশের কাছেও সরাসরি যায়, তা কিন্তু নিশ্চিত করা হচ্ছে না।

আলাপকালে নিরাপদে প্রাযুক্তিক উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে বুয়েট নিজ উদ্যোগেই একটি সিকিউরিটি সেল গঠন করেছে বলে জানান ড. মোহাম্মদ সোহেল রহমান। তিনি বলেন, এই সেলে ৬ জন বিশেষজ্ঞ কাজ করছেন। এদের মধ্যে ৪ জন ডক্টরেট। তারা মূলত দেশের ব্যাংকিং খাতের নিরাপত্তা সামাল দিতে কাজ করছে। তবে এই সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। আসলে দেশের প্রযুক্তি প্রাঙ্গণকে নিরাপদ রাখতে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে হবে।

তাহলে তার এই কাজ অপরাধ বলে গণ্য হবে। আইনের ১ উপধারায় বলা হয়েছে– 'কোনো ব্যক্তি যদি ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন অথবা যার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে প্রদান করা হয়, তাহা হলে তার এই কার্য হবে একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এর অধীন অপরাধ করলে তিনি অনধিক চৌদ্দ বছর এবং ন্যূনতম সাত বছর কারাদণ্ডে এবং অনধিক ১ কোটি টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।'

সাইবার অপরাধ দমনের পদক্ষেপ

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, ২০১৩ সালে ২৫টি, ২০১৪ সালে ৬৫টি, ২০১৫ সালে ২০৭টি এবং চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ২০০টির বেশি সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েছে পুলিশ। জানা গেছে, সাইবার অপরাধ তদন্তে সিআইডির মতো বিশেষায়িত কোনো তদন্ত দল পুলিশের অন্য কোনো শাখায় নেই। তাই দেশজুড়ে সংঘটিত এ সংক্রান্ত অভিযোগগুলো নিয়ে কাজ করতে বেশ হিমশিম খেতে হচ্ছে সিআইডিকে। সাইবার অপরাধ তদন্তে বিভিন্ন দেশ থেকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার শেখ রেজাউল হায়দার জানান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কমপিউটার থেকে সাকা চৌধুরীর রায় ফাঁস, বাংলাদেশ ব্যাংকের 'রিজার্ভ হ্যাকিং' এবং সম্প্রতি জঙ্গিদের ঘটনাগুলোর সাইবার অপরাধসংশ্লিষ্ট সব তদন্ত করতে গিয়েই তারা দম ফেলার সময় পাচ্ছেন না। এর ওপর ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) থেকেও বিভিন্ন মামলা আসছে, তা নিয়ে হিমশিম খেতে হচ্ছে। সাইবার অপরাধ দমনে সিআইডির পাশাপাশি পুলিশের বিশেষায়িত নতুন ইউনিট 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) রয়েছে। প্রতিষ্ঠার প্রায় ২৬ মাস পর গত ৫ জানুয়ারি পুলিশের তদন্তকাজে বিশেষজ্ঞ এই ইউনিটের বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ হয়। এখানে সাইবার অপরাধ নিয়ে কাজ করছেন পাঁচজন কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এডিশনাল এসপি), একজন সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি), দুজন পরিদর্শক ও একজন সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)। অপরদিকে সাইবার অপরাধ তদন্তে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নেও (র‍্যাব) বিশেষায়িত কোনো ইউনিট না থাকলেও বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত অভিযোগ পেলে কর্মকর্তারা নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেন বলে জানান র‍্যাবের মুখপাত্র আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক মুফতি মাহমুদ খান কজ